

অবগুণ্ঠন উন্মোচন : আসিফ আরসালান

বোমা হামলা বোমাতঙ্ক এবং লাল মিঞাদের লাফালাফি

বাঘ লাফায় ১২ হাত ফেউ লাফায় ১৩ হাত

একটি গল্প দিয়ে আজকের আলোচনা শুরু করছি। বছর পাঁচেক আগে এটি একটি গল্প হিসাবে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। পাঁচ বছর পর দেখছি এই গল্পটি আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনীতির সাথে কি সুন্দরভাবে খাপে খাপে মিলে যায়। প্রথমে গল্পটি বলে নিই। লন্ডনের একটি ম্যাগাজিনে এটি ছাপা হয়েছিল। আসলে এটি ছিল একজন তরুণ রুশ গল্প লেখকের একটি ছোট গল্পের ইংরেজি ভাষানুবাদ। গল্পটির সারমর্ম হলো, নভেম্বরের বিপ্লব দিবসে মস্কোর রাজপথে দেখা গেল একটি রুশ ভালুক। ভালুকটি অতিকষ্টে ধীর পায়ে হাঁটছে। তার চোখ দু'টি একটি কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা। তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'গরবাচেভের পেরেকজকা'। ভালুকটির সারা গায়ে অসংখ্য জখমের চিহ্ন। তা দিয়ে অনবরত রক্ত ঝরছে। জখমগুলোর স্থানে লেখা 'ইয়েলৎসিনের ডেমোক্র্যাটিক রিফর্ম'। ভালুকটি হাঁটতে পারছে না ভালোভাবে। কারণ, তার প্রতি পায়ে সোনালি শেকল জড়ানো। তাতে লেখা, 'আমেরিকার ডলার-ঘুষ।' ভালুকটির পিঠে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তার মাথায় একটা সাদা টুপি। তার একদিকে কাস্তে-হাতুড়ি এবং অন্যদিকে আফল স্যামের হাসিমুখ ছবি। ভালুকটির লেজে একটি বিবর্ণ, ছিন্দ্‌প্রায় লাল পতাকা ঝুলছে। তাতে লেখা 'মহান রাশিয়ান বিপ্লব।'।

বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলনের হাল আমলের চেহারা সুরত দেখে এই গল্পটির কথা মনে পড়ল। গল্পের কাহিনীর মতই সারা গায়ে অসংখ্য জখমের চিহ্নের মত মলোঁলিথিক এক দলীয় স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে এদেশের কমিউনিস্টরা বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। কমিউনিস্টদের কেন্দ্র নির্ভর কমান্ড ইকোনমির পরিবর্তে বাংলাদেশের বামওয়ালারা মুক্তবাজার অর্থনীতির 'উদারীকরণ' ও 'সংস্কার কর্মসূচী' পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছেন। কমিউনিস্টদের রেজিমেণ্টেড অর্থনীতির পরিবর্তে বামেরা বাংলাদেশে ডলার পাউন্ড কামাই করার ধান্দায় মশগুল। কমিউনিস্টদের কাস্তে হাতুড়ির পরিবর্তে এখনকার বামেরা চরকা চিহ্নিত পতাকার বন্দনায় মত্ত। আসলে বাংলাদেশী লালমিয়াদের এহেন চেহারার মাঝে বুকে উৎকীর্ণ সেই চটকদার শ্লোগান, 'মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব!' এখন বাংলাদেশে এরা এক সময়ের রুশ বা চীনা কমিউনিস্টদের মত অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলে না। রুশ চীনের কমিউনিস্টরা জোন্ডার জমিদার এবং মহাজনের শোষণের কথা বলে না। সারা পৃথিবী জুড়ে পশ্চিমা বিশেষ করে মার্কিনীরা যে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও এরা মুখ খোলে না। শ্রেণী সংগ্রাম এদের অভিধান থেকে নির্বাসিত। 'সর্বহারার একনায়কত্ব' এদের কাছে এখন মরা অতীত। এখন এদের ধ্যান-জ্ঞান সব এক। সেটি হল 'মৌলবাদের' জুজু। মার্কস-এ্যাঙ্গেলস, লেলিন-স্টালিন, মাওসেতুং, হোচিমিন ও ফিডেল ক্যাস্ট্রোর রক্তাক্ত বিপ্লবের পরিবর্তে এবং অষ্টগ্রহের জপ করছে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের শ্লোগান। বাংলাদেশের কমিউনিস্টদেরকে এখন মানুষ ঠাট্টা করে বলে 'হলিউড কমরেড!' এরা এখন স্যুটেড বুটেড। দুই ঠোঁটের ফাঁকে পশ্চিমের তৈরি বেনসন এ্যান্ড হেজেস। দাবড়াচ্ছেন জাপানী কোরিয়ার গাড়ী।

নজরুলের কবিতার দুটি লাইন ধার করে অতীতে কমিউনিস্টরা শ্লোগান দিতেন :-

জয় নিপীড়িত জনতার জয়

জয় নব উত্থান।

এখন ওদের একমাত্র শ্লোগান হ'ল, 'মৌলবাদ ধ্বংস হোক, ধর্মনিরপেক্ষতা কায়ম কর।' কিন্তু ওরা কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজম কায়ম করবে? জনতার ম্যান্ডেট নিয়ে ওরা তো কোথাও ধর্ম নিরপেক্ষতা কায়ম করতে পারেনি। তাহলে বাংলাদেশে সেটা প্রতিষ্ঠা করবে কিভাবে? ওদের তাত্ত্বিক গুরু সেই অপ্রীতিকর সত্যটি বলে ফেলেছেন।

॥ দুই ॥

আমাদের দেশে একশ্রেণীর প্রগতিবাদের ধ্বজাধারী তুরস্কের নেতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ। কারণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর জনগণকে সাথে নিয়ে কামাল আতাতুর্ক নাকি তুরস্কে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যারা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস কমবেশী পড়াশুনা করেছেন তারা তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার প্রকৃত কাহিনী জানেন। কিন্তু সেটাকে আড়াল করার জন্য যারা জনসমর্থনের কাহিনী রচনা করেন তাদের জারিজুরি ফাঁস করে দিয়েছেন সেই তাত্ত্বিক গুরু। তিনি বলছেন, আমার মতে, আতাতুর্কও সহজ ও স্বাভাবিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ করেননি। তিনি তুরস্কে আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবর্তনের নামে ধর্মসংহার নীতিগ্রহণ করেছিলেন। আইন ও অস্ত্র দ্বারা অপরাধ দমন করা যায়, কোনো বিশ্বাসকে দমন করা যায় না। তার প্রমাণ, আতাতুর্কের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্কে ধর্মচর্চার প্রাবল্য দেখা দেয়। তুরস্কের সমাজে ধর্মের প্রভাব বাড়তে বাড়তে এখন তা রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার মতো শক্তি ও জনসমর্থন অর্জন করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা নয়, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সামরিক আইন ও সামরিক বাহিনীর শক্তি দ্বারা তুরস্কে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাকে পাহারা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে। আলজেরিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতার জারিজুরিও এই তাত্ত্বিক গুরু ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, একই কথা বর্তমানের আলজেরিয়া সম্পর্কেও সত্য। এখানেও সামরিক পাহারায় রয়েছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা। তাও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে। এই গ্লোবাল সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদ নিজেদের স্বার্থে কোথাও ধর্মীয় মৌলবাদের বন্ধু এবং কোথাও মৌলবাদের শত্রু। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমানে নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য তালেবান ও আল-কায়েদা সন্ত্রাস দমনকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে বিশ্বে একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।

সুতরাং জনসমর্থনে বলীয়ান হয়ে সেকুলারিজম রাষ্ট্রক্ষমতায় উঠে এসেছে, এমন উদাহরণ কোনো মুসলিম দেশে পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশে তথাকথিত প্রগতিবাদী এবং ‘মৌলবাদ’ নামক শব্দের আড়ালে ইসলাম বিরোধীতাকারী মহলটি এই উপমহাদেশের দুই প্রধান নেতা এমএ জিন্নাহ ও মোহনদাস করমচাদ গান্ধীর নামের আগে বিশেষণ জুড়ে দেয়ার ব্যাপারে নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন। জিন্নাহর নাম, লেখার বা উচ্চারণ করার সময় লেখেন ‘মিস্টার’ জিন্নাহ। কিন্তু গান্ধীর বেলায় লেখেন ‘মহাত্মা’ গান্ধী। কোন্‌ গুণাবলীতে গান্ধী হলেন ‘মহাত্মা’ আর জিন্নাহ হলেন ‘মিস্টার’? ঐ দেশের গান্ধী ভক্তরা সম্ভবত বলতে চান যে, গান্ধীর ছিল মহৎ আত্মা। তাই তিনি ছিলেন মহাত্মা। আর জিন্নাহর ভেতরে ঐ ধরনের কোনো মহত্ত্ব ছিল না। তাই তিনি ছিলেন শুধুই মিস্টার। তাহলে গান্ধীর মধ্যে কোনটি ছিল এত মহৎ গুণ যে জন্য তিনি হলেন মহাত্মা? ওরা বলে যে, গান্ধী নাকি হিন্দু মুসলমান কোনো ভেদাভেদ করতেন না। সকলকেই মানুষ বলে ভাবতেন। সে জন্যই তিনি ছিলেন বিরাট আত্মা বা মহাত্মা। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। এই বিষয়টি সম্পর্কেও থলির বিড়াল বের করে দিয়েছেন তাদের ঐ বয়স্ক গুরুজী। তিনি বলছেন, অনেকে বলেন, মহাত্মা গান্ধী যদি তার স্বাধীন আধুনিক ভারত গড়ার পরিকল্পনায় রামরাজ্য গড়ার স্লোগানটি না ঢোকাতেন, তার রাজনীতিতে যাগযজ্ঞ প্রার্থনা উপাসনার আধিক্য না ঘটাতেন, তাহলে তার পাল্টা ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবীটি সম্ভবত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতো না। গান্ধীই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত শওকত আলী ও মোহাম্মদ আলীকে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নামের আগে মাওলানা লাগিয়ে ভারতের মুসলমানদের প্রভাবিত করার উপদেশ দিয়েছিলেন। আবার এই মহাত্মাই ছিল জওহর লাল নেহরুর বোন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী নেহরুর (পরে পণ্ডিত) বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকা। বিজয়লক্ষ্মী প্রেমে পড়েছিলেন এক উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম নেতার (স্বাধীন ভারতে তিনি বিদেশে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন)। বিজয়লক্ষ্মী এই মুসলমানকে বিয়ে করার জন্য জেদ ধরেন। জওহর লাল ও বিজয়লক্ষ্মীর পিতা মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সামনের সারির নেতা হলেও রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মেয়ের জেদ দেখে শর্ত দিয়েছিলেন, মহাত্মা গান্ধী যদি এই বিয়ে সমর্থন করেন তাহলে তিনি তাতে সম্মতি দেবেন। সারা অবিভক্ত ভারত তখন মহাত্মাজির দিকে চোখ ফিরিয়েছিল, তিনি এখন কি করেন? হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ বর্জিত অখণ্ড স্বাধীন ভারত গঠন যার স্বপ্ন, সেই মহাত্মা-নেহরু পরিবারের এ প্রস্তাবিত বিয়ে সম্পর্কে কি মত দেন? গান্ধী অনেক ভেবে-চিন্তে মত প্রকাশ করেছিলেন, অবশ্যই এই বিয়ে হতে পারে। তবে বিজয়লক্ষ্মী ও তার স্বামীকে ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পালন (সহবাস থেকে বিরত থাকা) করতে হবে। এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদের পর বিয়েটি আর হয়নি। বিজয়লক্ষ্মীকে পণ্ডিত পদবিধারী এক সমগোত্রীয় হিন্দু ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। তৎকালীন তরুণ কংগ্রেস নেতা এবং নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু (জওহর লালের বন্ধু) রফি আহমদ কিদোয়াই এই বিয়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় অত্যন্ত হতাশা জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, “বিজয়লক্ষ্মীর বিয়ের ব্যাপারে বাপুজি যা করলেন, তাকে হিপোক্রেসিস আখ্যা দিলে কি কোনো অন্যায় করা হয় অথবা বাপুজির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো হয়?”

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যারা অস্টপ্রহর ধর্মনিরপেক্ষতার বন্দনা করছেন তারা জানেন না অথবা স্বীকার করতে চান না যে, অনেক দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাও কায়ম করা হয়েছে বন্ধুকের নলের মুখে। পক্ষান্তরে ইসলামকে ধিকৃত করার জন্য বিদেশী প্রভুর ইঙ্গিতে যারা মৌলবাদ নামক শব্দটা আবিষ্কার করেছেন তারা উঠতে বসতে মৌলবাদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করেছে। অথচ একথা স্বীকার করতে ওরা শরম পান যে, যেসব রাষ্ট্রে এদের ভাষায় মৌলবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই শাসন কিন্তু কায়ম হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের রায়ে।

॥ তিন ॥

৯০/৯১ সালে বিশ্বজুড়ে কমিউনিজমের পতন ঘটেছে। আর বাংলাদেশে কমিউনিজমের ফুলই তো ফোটেনি। তার আগেই এদেশের লালমিয়ারা এতিম হয়ে গেলো। তো এখন তারা করবে কি? বড় করুণ, বেহাল এবং নাজুক অবস্থা এই বামপন্থীদের! এরা তো এজেঙ্গী বা দালালি করে খায়। ‘৮০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত এদের কেউ কেউ মস্কো আর কেউ কেউ পিকিংয়ের দালালি করে খেত। এখন মস্কো এক পতিত ব্যাঘ্র। তার দাঁত নাই। ধারাল নখ নাই। ফলে সে একটি টোঁড়া সাপ। ঐদিকে গণচীন এখন অর্থনৈতিকভাবে ধনবাদী এবং রাজনৈতিকভাবে সমাজবাদী। পিকিং আর দেশে দেশে বিপ্লব রফতানি করে না। সুতরাং এখন মস্কো বা পিকিংয়ের কাছে তাদের বাংলাদেশী এজেন্টদের কোনো কদর নাই। তাহলে ওরা এখন কি করে খাবে? বাড়ীর কাছে ভারত। সুতরাং বামপন্থীরা এখন ভারতের দালালীকেই তাদের প্রধান কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ঐদিকে ভারত ইসরাইলকে তার প্রধান দোসর হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর ইসরাইল আমেরিকার ‘ব্লুআইড বয়’ বা নীল নয়না বালক। ভারতের সাথেও আমেরিকার দোস্তী এখন কড়া। আমেরিকা এবং ভারত উভয়েরই কমন এজেন্ডা হল ‘সন্ত্রাস’। উভয় দেশেরই আক্রমণের অভিনু লক্ষ্য হলো মৌলবাদ বা ইসলাম। আর ইসলামী আন্দোলনের নেতা বা কর্মীরা ওদের চোখে হলো মৌলবাদী সন্ত্রাসী বা ইসলামী জেহাদী। সারা দুনিয়ার যেখানে যা কিছু ঘটছে তার সবকিছুর জন্যই দায়ী হল ইসলাম। তাই সন্ত্রাসী বা জঙ্গী নাম দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদ তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা ও কর্মীদেরকে খতম করাই হল ওদের এজেন্ডা।

‘রাজা যাহা বলে পারিষদ বলে তার শতগুণ।’ আরো কথায় বলে, ‘রাজা কইছে কিসের ভাই আনন্দের আর সীমা নাই।’ এই মুহূর্তে আওয়ামী ও বামদের মনিব বা রাজা হল দিল্লী। দিল্লী চায় ঢাকার চারদলীয় জোট সরকার বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতকে মৌলবাদী চরমপন্থী হিসাবে চিহ্নিত করা হোক। আর যায় কোথায়! ‘বাঘ লাফায় ১২ হাত আর কেউ লাফায় ১৩ হাত।’ দিল্লী কইছে কিসের ভাই বাংলাদেশী কম্যুনের আনন্দের আর সীমা নাই।’ জগুিস রোগীর চোখ হয় হলুদ। তাই সবকিছুই তারা হলুদ দেখে।

বাংলাদেশী বামদের চোখ একটি বিশেষ বর্ণ ধারণ করেছে। এখন যেখানেই বোমা সেখানেই ইসলামী জঙ্গী। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত আনোয়ার চৌধুরীর সিলেট সফরে বোমা। তো দায়ী হল ইসলামী জঙ্গী। গুলশান হাট্টেলে গাড়ীবোমা, সেখানেও ইসলামী জঙ্গী। বিমানবন্দরে বোমা। সেখানে ইসলামী জঙ্গী।

সিলেটের বেতার ভবন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমা। সেখানেও ইসলামী জঙ্গী। ভূতের ভয় যখন মানুষকে তাড়া করে তখন সব জায়গায় তারা ভূতের নাচন দেখে। আমাদের বামপন্থীদেরকে ইসলামী জঙ্গীর ভূত তাড়া করছে।

আজকের কলামিস্ট শুরু করেছিলাম একটি রুশ গল্প দিয়ে। এখন বাংলাদেশী লালমিয়ার কাণ্ড-কারখানাকে ঐ রাশিয়ান ভালুকটির সাথে তুলনা করণ। দেখবেন, ঐ অথর্ব রুশ ভালুকটির মত বাংলাদেশী লালমিয়ারও কেমন বেহাল দশা।

প্রসঙ্গ ১৫ই আগস্ট :

আলো আর অন্ধকার নিয়ে কিছু কথা

-মোহাম্মদ তাজামুল হোসেন

সুসভ্য মানুষই আলোকিত মানুষ। আর দুনিয়ার মানুষকে সুসভ্য করেছে ইসলাম। ইসলাম না আসলে মানুষ সুসভ্য হত না। অসভ্য থাকত। বর্বর থাকত। একারণেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্য সার্বজনীন বাণী সম্বলিত আলকোরআন সুস্পষ্টভাবে বলেছে, ‘মিনাজ জুলুমাতে এলান্নূর’। অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলো। আর এর বিপরীত হলে হয় আলো থেকে অন্ধকার। মুসলমানরা এভাবেই বিশ্বাস করে। কেউ মুসলমান বলে নিজেকে দাবী করতে চাইলে তাকে এ ভাবেই বিশ্বাস করতে হয়। এ ভাবে বিশ্বাস করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। অমুসলমান বা মোনাফেকদের কথা ভিন্ন।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ক’দিন আগে একটি দলীয় আলোচনা সভায় পট্টাপট্টি করেই বলেছেন যে, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট তার পিতাকে ‘হত্যা’ করার পর বাংলাদেশে এক অন্ধকার যুগের সূচনা ভয়। সত্যিই কি তাই? তাহলে কি ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের আগে তার পিতা শেখ মুজিবের শাসনকাল (১৯৭২-৭৫) আলোর যুগ ছিল? অন্ধকার বা জুলুমাতে বলতে কোন কিছুই ছিল না? ছিল নাকি কোন ধরনের অন্যায়, অনাচার, বঞ্চনা, শোষণ, নির্যাতন, খুন, খারাবি, মারামারি কাটাকাটি? ছিল কি দেশের মানুষ সবার জন্য অনাবিল সুখ শান্তি, দুধ আর মধুর নহর? অবাধ নিরপেক্ষ ভোটের অধিকার? মতামত প্রকাশের নির্ভয় অধিকার? স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা? দুর্নীতি মুক্ত সমাজ? কোনই সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশের মানুষ অনেক অনেক আশা করেই শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশ শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল। একারণে অনেক মানুষেরই ত্যাগ ছিল তুলনাহীন। কিন্তু একথাও রুচ সত্য এই যে, সেই মানুষই আবার মাত্র সাড়ে তিনটি বছরের ব্যবধানে সেই এক সময়ের অতি জনপ্রিয় নেতা মুজিবকে এমনকি তুচ্ছ তচ্ছল্য বা ঘৃণা করা শুরু করেছিল যে তাও নজীর বিহীন। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যখন ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট একটি সংক্ষিপ্ত ও সফল সেনা অভ্যুত্থানে তার মর্যাদাসিক্ত মৃত্যু ও পতন হয়েছিল। অতি অবাধ কাণ্ড ছিল এই যে, যে মানুষই যেইমাত্র তার পতনের খবর জেনে ছিল, সেই তখন তখনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। খুশী হয়েছিল। আনন্দ উল্লাস করেছিল। কেউ কেউ আল্লাহর কাছে শোকরানা আদায় করেছিল। মিষ্টি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারও ঘটেছিল। শোকরানা নফল নামায, মোনাজাত ইত্যাদি কাজও কেউ কেউ করেছিল। সে দিন ছিল শুক্রবার। তাই জুমার নামাজ শেষে অনেক মসজিদেই শোকরানার মোনাজাত ছাড়াও যারা সেই মুজিবের পতন ঘন্টা বাজিয়েছিল, সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, সেসব নাম না জানা সেনা সদস্যদের জন্য মনভরে দোয়া করেছিল। তাদের দীর্ঘায়ু ও সহিসালামতি চেয়ে আল্লাহর দরবারে একান্তভাবেই মোনাজাত করেছিল। এসব কি অবাধ হবার বিষয় ছিল না? আরো অবাধ হবার বিষয় কি ছিল না যে, আমাদের আজতক জানা মতে, প্রায় কোন একটি প্রাণীও সেই ‘জনপ্রিয়’ মানুষটি মুজিবের জন্য কোন সহানুভূতি জানায়নি। সহানুভূতিতে সেই সেনাদের প্রতিরোধ তো অনেক দূরের কথা? আরো জানা গেছে যে, মুসলমান মুজিবের জন্য কোন একজন মুসলমানও আল কোরআনের সেই বিখ্যাত আয়াত “ইন্না লিল্লাহ” যা কিনা প্রতিজন মুসলমান অন্য মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করেন তাও কেউ করেনি! কি আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু কেন? মানুষের সেই ১৫ই আগস্ট (৭৫)কি অনুভূতি ছিল? আলো থেকে অন্ধকারে ডুববার নাকি গভীর অন্ধকার থেকে আলোর ঠিকানা পাবার? আলো থেকে অন্ধকারে পতিত হলে কেউ কি আনন্দিত হয়? খুশী হয়? আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করে? শেখ হাসিনা তবে কোন অন্ধকারের কথা আমাদের বুঝাতে চাইছেন? নাকি ওসব সময়ের সঠিক তথ্য নিয়ে যে নতুন প্রজন্ম অজ্ঞ, তাদের সেসব সীমাহীন অজ্ঞতার বা শূন্যতার সুযোগ নিয়েছেন শেখ হাসিনা? কে জানে তার দুর্ভাগ্য কিনা এই যে, আমরা ঐ সময়ের সচেতন নওজোয়ান এখন পৌরত্বে বা বার্ষ্যক্যে বেঁচে আছি। আল্লাহর রহমতে সেসব বিভীষিকার অন্তত কিছু কিছু স্মৃতি এখনো সচেতনভাবেই বহন করে চলেছি। আমরা মনে রেখেছি যে, বহুদলীয় যে গণতন্ত্রের মুজিব কবর দিয়েছিল ১৫ ই আগস্টের পর পরই তা পুনরুদ্ধার করা গিয়েছিল- চরম অন্ধকার থেকে আলো দেখেছিল মানুষ।

শেখ মুজিব আমাদের আট আনা বা পঞ্চাশ পয়সা সের দামে চাল আর ছয় আনা সের দরে গমের আটা খাবার ওয়াদা করেছিলেন। ১৯৭৫ এ সেই চাল মানুষ ১৫ই আগস্ট এর আগে ১০/১২ টাকা সের দামে খাইয়ে তবেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। অন্য সব জিনিষপত্রের দামেরও একই মাত্রায় ১৫/২০ গুণ বাড়িয়ে তবেই তিনি সাড়ে তিন বছরের মাথায় ‘তিন বছর কিছুই দিবার পারুম না’ এই কথা বলে আগের দেয়া সকল ওয়াদা ভঙ্গ করেছিলেন। অবশ্য ১৫ই আগস্টে তার পতনের সাথে সাথেই বাজার দর সেই আট আনা, ছয় আনা না হোক প্রায় এক তৃতীয়াংশ নেমে গিয়েছিল বিশেষ করে চাল আটার দাম। কি তেলসমৃতি কাণ্ড! খতম হয়েছিল মুজিবের ব্যক্তি শাসন, ফলে অন্তত শুদ্ধ হয়েছিল ভারতীয় মারোয়ারী ব্যবসায়ী তাদের এদেশীয় দালালদের তীব্র শোষণ, অসাধু ব্যবসায়ের পাটনারশীপের লাভালাভ ইত্যাদি তাতেই কিনা নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার দর রাতারাতি নেমে গিয়েছিল প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কেননা, ওপারের শোষণের ও কালোবাজারীর চেইন এ ছেদ হলে এমনিতেই এ দেশের অর্থনীতি যে চাঙ্গা, সবল ও সচল থাকে

তাই ছিল অতি স্বাভাবিক, মানুষ হিসেবে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছিল তার ৬ দফায় যেসব ওয়াদা শেখ মুজিব মানুষকে দিয়েছিলেন, সোনার বাংলা শৃশান কেন বড় বড় লাখো পোস্টারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তার সবই যেন তাদের কাছে ভুল ঠেকেছিল।

কেনই বা মানুষের হাহাকার খাবার-দাবারের অভাব, অনাহার, অনাহারে লাখ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি শনির দশা তাদের নিত্য সাথী হয়েছিল কেন? কেনইবা মানুষের ভাতের অধিকার হরণের সাথেই ভোটের অধিকারটুকুও সেই স্বাধীনতার প্রায় এক বছরের মাথায় ১৯৭৩ এর নির্বাচনেই হরণ করা হয়েছিল? কেনইবা মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাভাবিক প্রতিবাদ স্তব্ধ করার জন্য সেই অতি গণতন্ত্রী মুজিবই পত্র-পত্রিকা বন্ধ করাসহ রক্ষীবাহিনী নামক একটি নির্মম ঘাতক বাহিনী দিয়ে সকল বিরুদ্ধ বাদীতা ডাঙা মেরে ঠাঙা করে চলেছিলেন। শুধু কি তাই? বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনীরাই যেমন কামাল, মনি, এসপি মাহবুব ইত্যাদি কি কম নির্মম বা কম ঘাতক ছিল? এসব বাহিনী ১৯৭২-৭৫ এর সাড়ে তিন বছরের মুজিব আমলে যে প্রায় ৪০ হাজার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তা কি মানুষের তখন ভুলে যাবার কথা ছিল? এরপর ১৯৭৫ এর জানুয়ারীতে সকল রাজনৈতিক দলসমূহ বেআইনী ঘোষণা করে শুধুমাত্র নিজের লোকজনকে দিয়ে একটি মাত্র দল বাকশাল গঠন করে তিনি নিজের গণতন্ত্রী চেহারাটার কি বারোটা বাজাননি? বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা ও ঐতিহ্যের কফিনে কি তিনি শেষ পেরেকটি নিজ হাতেই ১৩ মিনিটের একটি সংসদের নজীরবিহীন সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বুকে নিয়ে নিজে নিজেই ইতিহাসের পচা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়নি? জাতিকে তিনি কি আলো থেকে চরম অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিলেন না? বহুদলীয় মুক্ত গণতন্ত্রের জায়গায় একদলীয় বাকশাল কি আলো থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না? ১৫ই আগস্ট কি সেটি পুনরুদ্ধার করেনি দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যখন অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছিলেন নিজেদের সম্মানজনকভাবে স্বাধীন দেশে বাঁচার কোন পথই বাকী আছে বলে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখনই কিছু আওয়ামী-বাকশালী নেতা, পাতিনেতা ক্যাডাররা প্রায় রাতারাতি অন্যের জমি সম্পত্তি, বাড়িঘর লুট দখল ইত্যাদি যতসব অসৎ উপায়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিলেন। দেশে ভিতরে ছাড়াও সুইজারল্যান্ড, লন্ডন, নিউইয়র্ক এমনকি ভারতের মত গরীব ও অনুন্নত দেশের কোন কোন ব্যাংকে ওদের এদেশ থেকে পাচার করা অর্থ কোটি কোটি সংখ্যায় ঐ তিন সাড়ে তিন বছরেই জমা করেছিলেন ওদের অনেকেই। ১৯৭৫-এর শেষ দিকে একমাত্র সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকেই প্রায় ৪০০ কোটি ডলার ওদের জমা ছিল বলে আমি নিজেই লগুনে ১৯৭৫-এর শেষ কালে একটি পত্রিকায় খবর পড়ে দেখেছিলাম। মুজিবের অতি একান্তজন সে সময়ের এদেশের রেড ক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার একারই ভারতের ব্যাংকে জমা ছিল প্রায় একশ' কোটি টাকা। এই একশ' কোটি টাকাই ওদের অতি বন্ধু দেশ সেই ভারতেই গাজী ও তার স্ত্রীর একই সাথে ঐ ভারতের মাটিতেই 'মোটর গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা যাবার কারণ ছিল বলেই অনেকের কাছে আমি কারণ হিসেবে শুনেছি! চুরিদারী করে সংক্ষিপ্ত সময়ে ভাগ্য কামাই করা ওদের ক্ষমতা দখলের একটি প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে ওসব অন্ধকারময় মানুষকে মরহুম মওলানা ভাসানী ঘৃণাভাবে সম্বোধন করতেন 'লুটপাট সমিতির সদস্য' এই বিশেষ বিশেষণে। একজন প্রখ্যাত অথচ আওয়ামী লীগার নয় এমন একজন মুক্তিযোদ্ধা (এখন মরহুম) আমাকে তার মৃত্যুর আগে (প্রায় ৮/৯ বছর আগে) বলেছিলেন যে, শেখ মুজিবই স্বয়ং এ ধরনের অন্যায়-অসৎ ভাগ্য কামাই করার জন্য পরোক্ষভাবে হলেও উৎসাহ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ এর প্রথম দিকে ঢাকার সিদ্দিকবাজার কমিউনিটি সেন্টারে মুজিব স্বয়ং নাকি সেই মুক্তিযোদ্ধাকে অনেকটা ধমকের সুরে বলেছিলেন, 'আমার ছেলেরা ১৯৫৪ সালের পর ১৭ বছর কোনকিছুই পায়নি, এখন ওরা না হয় কিছু কিছু খাচ্ছে, তাতে তোর চোখ টাটায় কেন?' আল্লাহ জানেন ওনি সত্যি বলেছিলেন কি না। তবে মিথ্যা বলার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

মুজিবের পরিবার এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে শেখ কামাল, শেখ মনি, শেখ নাসের ইত্যাদি আরো অনেকের নিপীড়ন, চৌর্যবৃত্তি, অন্যের সম্পত্তির জবরদখল ইত্যাদি কোন ধরনের আলো ছিল? নাকি সবই ছিল অন্ধকার আর গহীন অন্ধকার?

শেখ হাসিনা শেখ মুজিবী শাসনকালের সাড়ে তিন বছরের কিঞ্চিৎ উল্লেখিত ওসব অন্ধকারময় বিষয়াদির কথা নতুন প্রজন্ম থেকে গোয়েবলসীর মিথ্যাচারের কায়দায় যে গোপন করতে চাইছেন তা আমাদের মত বৃদ্ধদের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য। এছাড়াও নব্য বাকশালী কায়দায় ভবিষ্যতের যে ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক আফিমের তথাকথিত 'আলো'র স্বপ্ন দেখাতে চান, তাও এই পোস্ট মডার্নিজম একাংশ শতাব্দীর সূচনাকালে কোন আলো যে নয় বরং আরো অন্ধকারময় হতে পারে, তার আলামতের কোন কমতি এখন নাই। ফিদেল কাস্ট্রোর কিউবা এবং কিম এর উত্তর কোরিয়া আর কতসময় সেই ওদের একদলীয় বা 'এক নেতা এক দেশ'-এর তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে টিকে থাকবে তা বোধ করি আর অল্পকাল মাত্র বেশী দিন নয়। কমিউনিস্ট চীন একদলীয় ব্যবস্থায় আপাততঃ টিকে থাকলেও মুক্ত বাজার এর সাথে তার প্রতিযোগীতা ঐ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অচিরেই নিঃশেষ হবে তা আন্দাজ করতে খুব একটা কষ্ট হবার কথা নয়। চীন আর কতটি 'টিয়ানম্যান স্কোয়ার' ট্রাজেডি ঘটতে ও তারপরও ঐ একইভাবে টিকে থাকবে তাও ভেবে দেখার বিষয়। আর ধর্মনিরপেক্ষতা? ইউরোপ আমেরিকা বা অনুরূপ উন্নত ও মুক্তবাজারের কোন দেশই এখন আর একশ' ভাগ ধর্মনিরপেক্ষ নয়। ওরা শিল্প বিপ্লব উত্তর সময়কালের মত আর 'ধর্মনিরপেক্ষ' থাকতে চাইছে না। কেননা, ঐ পাপের ফলে তারা অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতের শিকার হয়েছে। ফলে ওদের দেশের সকল জ্ঞানী-গুণী-বিবেকবান মানুষ পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃ জাগরণের বিষয়ে ভীষণ জোর দিচ্ছেন। আমেরিকার এ বছরের নির্বাচনে বুশ ও কেরী দু'জনই এই 'পারিবারিক মূল্যবোধ' পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপর খুবই জোর দিচ্ছেন। এ নিয়ে ২০০৪ এর নভেম্বরের নির্বাচনে উভয়েই ওয়াদা করছেন। বলছেন যে এই মূল্যবোধ কায়ম করে রাখা ছাড়া দেশের সমূহ আরো ক্ষতি হবে। আর এ জন্য যে ধর্মনিরপেক্ষতার পথ পরিহার করে আধ্যাত্ববাদের দিকে প্রতিটি নাগরিককে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে তা বোধকরি বুদ্ধিমান প্রতিজন মানুষের কাছে অতি পরিষ্কার। তাই শেখ হাসিনা যদি সেই 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'সমাজতন্ত্র' নামের বস্তাপচা তথাকথিত 'মানবিক' আদর্শকে এখনো 'আলো হিসেবে বিবেচনা করতে থাকেন, অন্যদিকে

ইসলামী মূল্যবোধের কালোত্তীর্ণ সঠিক ধারাকে ‘অন্ধকার’ বলে এখনো মহাভ্রম করতে থাকেন, তাহলে কেউই তাকে বোধ করি মুসলিম প্রাধান্যের বাংলাদেশে অন্ততঃ রাজনীতিতে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তিনিই থাকবেন অন্ধকারে, যেমন ছিলেন মুজিব।

